বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পোস্টারের বিবর্তন

চিত্রকলা থেকে ডিজিটাল পুনরুৎপাদনের স্বরূপ বিশ্লেষণ

মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন
তানিয়া সুলতানা

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পোস্টারের বিবর্তন

চিত্রকলা থেকে ডিজিটাল পুনরুৎপাদনের স্বরূপ বিশ্লেষণ

মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন
তানিয়া সুলতানা

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

মহাপরিচালকের কথা

চলচ্চিত্রের মতো বাংলাদেশে পোস্টার শিল্পেরও রয়েছে দীর্ঘদিনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। চলচ্চিত্র সময়-কাল, সমাজ-সামাজিকতা ও পরিবার-পরিবেশের চলমান চিত্রকে ধারণ, নির্মাণ এবং প্রকাশ করে। এহেন চলচ্চিত্রের ভাবার্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে পোস্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিষয়টিকে গবেষণার ক্ষেত্রে হিসাবে বেছে নিয়েছে এ গ্রন্থের লেখক ও গবেষকদ্বয়। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের অধীনে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পোস্টারের বিবর্তন: চিত্রকলা থেকে ডিজিটাল পুনরুৎপাদনের স্বরূপ বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণাকর্মটি তাঁদের পরিশ্রমেই সম্পন্ন হয়। গবেষণাটি এবছর গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

গ্রন্থটির দুটো পর্যায়ে ভাগ। যার প্রথমভাগে রয়েছে বিশ্ব তথা উপমহাদেশীয় চলচ্চিত্র পোস্টারের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পোস্টারের ইতিহাস এবং বিবর্তন। প্রযুক্তি, সময় আর ব্যবসায়িক উত্থান-পতনের সাথে সাথে এই শিল্প মাধ্যমটি কীভাবে তার গতিমুখ নির্ধারণ করছে– সেই বয়ান। দ্বিতীয়ভাগে রয়েছে বিভিন্ন দশকের কিছু প্রতিনিধিত্বশীল পোস্টার। গবেষকদ্বয় দেখিয়েছেন বিভিন্ন রঙ, রেখা, ছবি, শব্দ বা বিন্যাসের সাহায্যে পোস্টার কীভাবে তার ভাষা তৈরি করে।

আমি চলচ্চিত্র গবেষক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন ও তানিয়া সুলতানা, গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ফাহমিদুল হক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সহকর্মী এবং অন্যান্য যারা এ গবেষণার জন্য পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন
জুন ২০১৬/ আষাঢ় ১৪২৩

ঋণ স্বীকার

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ প্রদত্ত ২০১৪-২০১৫ সালের ফেলোশিপের আওতায় লেখকদ্বয় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পোস্টারের বিবর্তনের ধারা এবং এর নন্দনতত্ত্ব নিয়ে একটি গবেষণা কর্ম সম্পাদনা করেন। এই গবেষণার ভিত্তিতেই 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পোস্টারের বিবর্তন: চিত্রকলা থেকে ডিজিটাল পুনরুপাদনের স্বরূপ বিশ্লেষণ' গ্রন্থটি প্রকাশ পেল। তবে গবেষণা কর্মটি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করতে গিয়ে এতে সংযোজন ও বিয়োজন করে পরিমার্জিত রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণাটির শুরু থেকে গ্রন্থ আকারে প্রকাশের বিভিন্ন ধাপে, নানা সময়ে লেখকদ্বয় মুখোমুখি হয়েছেন নানান প্রতিকূলতার। এই প্রতিকূলতাগুলো দূর করতে যার ভূমিকা অনন্য তিনি আর কেউ নন, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সন্মানিত মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন। তাই বইয়ের শুরুতেই প্রথম ধন্যবাদটা আমাদের বিবেচনায় তারই প্রাপ্য।

এরপর ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণা কর্মটির তত্ত্বাবধায়ক ফাহমিদুল হকের প্রতি। চলচ্চিত্র গবেষণা করতে গিয়ে তার মতন একাধারে চলচ্চিত্র এবং গবেষণায় পণ্ডিত ব্যক্তিকে পাওয়াটা ছিল ভাগ্যের বিষয়। কাজের নানান পর্যায়ে তার সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধায়ন, নির্দেশনা ও পরামর্শ শিরোধার্য হলেও অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের কমতি থেকে গেছে। এরপর কৃতজ্ঞতা জানাই চলচ্চিত্রবিদ্যার শিক্ষক ও চলচ্চিত্রকার সাজেদুল আউয়ালের কাছে পান্ডুলিপি সম্পাদনার মতো কষ্টকর কাজটি করার জন্য।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পোস্টারের বিবর্তন নিয়ে তথ্য ও মন্তব্য দিয়ে সহায়তা করেছেন পোস্টার নির্মাতা মোহাম্মদ শোয়েব, মোজাহারুল ইসলাম ওবায়েদ, বিদেশ কুমার ধর, গ্রাফিক ডিজাইনার শিবু কুমার শীল, চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক আজিজুর রহমান এবং চলচ্চিত্র পরিচালক এবং শিক্ষক মতিন রহমান প্রমুখ। তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক ভাষা আমাদের কাছে নেই। তাদের সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পোস্টারের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের উপ-সহকারি প্রকৌশলী স্মিতা বড়ুয়া এবং ফিল্ম ইনভেস্টিগেটর ফখরুল আলম সোহাগ অকৃত্রিম সাহায্য করে লেখকদ্বয়কে কৃতজ্ঞতার

পাশে বন্দী করেছেন। তারা পোস্টার সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সার্বক্ষণিক সহায়তা করেছেন। এছাড়া বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই সহকারি পরিচালক মোহাম্মদ আরিফুজ্জামানকে এই গবেষণাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে তার সার্বক্ষণিক সহযোগিতার জন্য।

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের জার্নালিজম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী আব্দুল মান্নান স্যারের কথা না বললেই নয়। গবেষণার শুরু থেকে বিভাগে সেমিনার আয়োজনসহ পুরো সময়টাতেই তিনি নিয়মিত খোঁজ খবর নিয়েছেন। পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের সহকর্মীদের প্রতিও। বিশেষ করে সহকারী অধ্যাপক নন্দিতা তাবাসসুম খান পুরো গবেষণা চলাকালীন সময় তার অতীত গবেষণা কর্মের অভিজ্ঞতার আলোকে লেখকদ্বয়কে আলোকিত করেছেন। এছাড়া বেশ কিছু চলচ্চিত্র পোস্টারের ছবিও তুলে দিয়েছেন তিনি। আরেক সহকর্মী সামিয়া আসাদী'র বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত জ্ঞান ধার করে পোস্টারের গুণগত আধেয় বিশ্লেষণে নানান তথ্য সম্মিলন করা হয়েছে। পোস্টারের পরিমাণগত আধেয় বিশ্লেষণের কাজটি বেশ আগ্রহ নিয়ে সম্পন্ন করেছেন স্নেহের ছোট বোন মুনতাহা করিম।

গ্রন্থটিতে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্তের ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। আগ্রহী পাঠক তা লেখকদ্বয়কে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে। আমাদের সর্বাধিক কৃতজ্ঞতা বাংলাদেশের পোস্টার শিল্পের সাথে জড়িত সকল শিল্পী ও কলা-কুশলীর প্রতি। যাদের পরিশ্রম, দক্ষতা, মননশীলতা এবং ভালোবাসায় আমাদের চলচ্চিত্রের পোস্টার, ব্যানার নান্দনিক ঐতিহ্যের শিখরে পৌছানোর ক্ষমতা অর্জন করেছিল। যাদের কথা ও কর্ম নিয়ে আমাদের এই বিশেষ আয়োজন।

জুন, ২০১৬
ধানমন্ডি, ঢাকা।

মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন
তানিয়া সুলতানা
শিক্ষক, জার্নালিজম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ
স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ।

সার-সংক্ষেপ

'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পোস্টারের বিবর্তন: চিত্রকলা থেকে ডিজিটাল পুনরুৎপাদনের স্বরূপ বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পোস্টারের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, ক্রমবিকাশ এবং এর বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে পোস্টারের নান্দনিক ও প্রতীকী গুরুত্বের পাশাপাশি প্রচারণা কৌশলের হাতিয়ার হিসেবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পোস্টার কী ধরনের অর্থ উৎপাদন করে এবং তা কতটা কার্যকর সেটা এই গবেষণায় অনুসন্ধান করা হয়েছে। গবেষণাটি দুটি বিশেষ তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি 'রেপ্রিজেন্টেশন' ও ফ্রাংকফুর্ট স্কুলের 'সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি' তত্ত্বের সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে গুণগত পদ্ধতিতে। এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য 'আধেয় বিশ্লেষণ' ও 'নিবিড় সাক্ষাৎকার' পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের চলচ্চিত্র সম্পর্কে অগ্রিম ধারণা দিতে বা দর্শকদের সিনেমা হলে টানতে বিভিন্ন ধরনের প্রচার মাধ্যম যেমন: দেয়াল পোস্টার, ব্যানার, লিফলেট, সংবাদপত্র/ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন, পোস্টার, গানের বই, লবি কার্ড বা প্রেসকার্ড ইত্যাদির ব্যবহার প্রথমদিক থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ১৯৩০ ও ১৯৪০ দশকে ঢাকায় সিনেমা হলের দেয়ালেই মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের নাম, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ছবি এঁকে চলচ্চিত্র সম্পর্কে দর্শকদের এক রকম ধারণা দেয়া হতো। এরপরে চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে আসে ব্যানার পেইন্টিং, তারপরে চলচ্চিত্র পোস্টার। ঢাকার চলচ্চিত্রে পোস্টার শিল্পের সূচনাকারী শিল্পীদের মধ্যে চলচ্চিত্রকার সুভাষ দত্ত ও আজিজুর রহমান অন্যতম। সুভাষ দত্ত ১৯৫৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এ দেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র *মুখ ও মুখোশ*-এর পাবলিসিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, এর শোকার্ড ডিজাইন করেন এবং টাইটেল কার্ড তৈরি করেন। চলচ্চিত্র পোস্টারের ডিজাইন করতো মূলত কমার্শিয়াল আর্টিস্টরা। এরা হচ্ছে ১৯৪৭ ও ১৯৬৫ সালে ভারত থেকে আসা অভিবাসী অবাঙালি মুসলিম ও স্থানীয় স্বশিক্ষিত শিল্পীরা।

চলচ্চিত্র পোস্টার তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমে চলচ্চিত্রের সাদা-কালো স্টিল ফটোগ্রাফির অ্যালবাম থেকে ছবি বাছাই করা হতো। বাছাইকৃত ছবি দেখে সাদা ফুলশিট কাগজে পেন্সিল স্কেচের মাধ্যমে পোস্টারের ডামি লে-আউট করা হতো। পরে স্টিল ক্যামেরাম্যান থেকে বিভিন্ন মাপ অনুযায়ি সাদা-কালো ছবি সাইজ অনুযায়ি আউট লাইন কেটে সেটিং করা হতো। এরপর ব্যাকগ্রাউন্ড বা খালি জায়গাগুলোতে বিভিন্ন রঙ নান্দনিকভাবে দেয়া হতো যেন দেখতে সুন্দর লাগে, ছবিগুলো ফুটে ওঠে। তারপর সাদা-কালো ছবিগুলোকে ট্রান্সপারেন্ট কালার দিয়ে রঙিন করার পর ওয়েল কালার বা পোস্টার কালার দিয়ে ঠিক করা হতো। এ ধরনের হাতে আঁকা চলচ্চিত্র পোস্টারের ডিজাইন অনেকদিন ধরে চলেছে।

এখানে শিল্পীদের মনের ইচ্ছা বা শৈল্পিক মূল্যের অগ্রাধিকার দেয়া হতো।

প্রথমদিকে চলচ্চিত্র পোস্টার মুদ্রণ করা হতো লিথোগ্রাফির মাধ্যমে। এরপরে আসে জিংকিং অক্সাইড প্রযুক্তি, তারপরে ব্লক প্রিন্টিং এবং ১৯৬৫ সালে অফসেট প্রিন্টিং। কিন্তু ব্যয় বেশি হওয়ার কারণে এই ব্যবস্থা বেশিদিন টেকেনি। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩-৭৪ সালে আবার অফসেটে পোস্টার মুদ্রণ শুরু হয়। আশির দশকে কালার ফটোগ্রাফির আবির্ভাবে ঢাকার চলচ্চিত্রে রঙিন পোস্টারের মুদ্রণ অনেক সহজ হয়। এ সময় পোস্টারের গ্রাফিক্স ও ডিজাইনে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। প্রযুক্তি, ছবির গল্প আর দর্শক চাহিদা পরিবর্তনের সাথে যুগে যুগে বদলে গেছে পোস্টারের ভাষা ও নান্দনিকতা, যার প্রভাব পড়েছে এর ডিজাইনে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের পোস্টার ডিজাইনে ভারসাম্য, বৈপরীত্য, গেজ এবং পজিশনিং বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনায় সেই সময়কার পোস্টার ছিল মূলত ইনফরম্যাল ভারসাম্য আর বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ। বিরাট বড় জায়গা জুড়ে থাকতো ব্যাকগ্রাউন্ড। সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হতো সিনেমার তারকা বা মূল চরিত্রের স্ট্যাটিক ইমেজ। সত্তরের দশকে চলচ্চিত্র পোস্টারে স্ট্যাটিক ইমেজের বদলে গতিশীলতা প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া এই সময়ে চলচ্চিত্র পোস্টারে ইমেজের ব্যবহার বেড়েছে আগের তুলনায় বেশি। ফলে পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের ইমেজের পরিমিতি বোধ এবং প্রপোরশন ইনের পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য কমতে শুরু করেছে। আশির দশকে পোস্টারে ছবির পাত্রপাত্রীর পোশাক-গহনা এমনকি পঞ্চাশ-ষাট দশকের সাদামাটা ব্যাকগ্রাউন্ডের পরিবর্তে এসময় দেখা যায় কাল্পনিক বা ফ্যান্টাসি প্রভাবিত ব্যাকগ্রাউন্ড যা ইসলামি সংস্কৃতির কিংবা এর প্রাকৃতিক দৃশ্যকে ইঙ্গিত করে।

আশির দশকে বিকল্প বা স্বাধীন ধারার চলচ্চিত্র পোস্টারে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও স্পেসের মুন্সিয়ানার ব্যবহার দেখা যায়। আবার, নব্বইয়ের দশকের চলচ্চিত্র পোস্টারে খলনায়কদের ছবি গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত হতে থাকে। শূন্য দশকে সিনেমা পোস্টার শিল্পে বইতে শুরু করে নৈরাজ্য ও অশ্লীলতার জোয়ার। বর্তমানে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণার সুবিধা, ব্যানার পেইন্টিংয়ে ডিজিটাল প্রিন্টের ব্যবহারের কারণে পোস্টারের গুরুত্ব অনেকাংশে কমে গেছে। আগের চলচ্চিত্র পোস্টার শিল্পীরা নিজের হাতে মনের মাধুরী ও আবেগ-অনুভূতি মিশিয়ে তৈরি করতেন। কিন্তু বর্তমানে গ্রাফিক ডিজাই-নাররা পোস্টার তৈরির সময় আগের শিল্পীদের মতো সেই সৃষ্টির আবেগ ও শিহরণ অনুভব করতে পারে না। বর্তমানে চলচ্চিত্র প্রসার ও বিপণনের জন্য শুধু পোস্টারের উপর পরিচালক ও প্রযোজকগণ নির্ভর না করে টেলিভিশন, ইন্টারনেট, বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম ও ইউটিউবে চলচ্চিত্রের প্রচারণা চালান। তবে আমাদের দেশে অবকাঠামোগত অনুন্নয়ন ও ইন্টারনেটের স্বল্প অভিগম্যতার কারণে এগুলো ব্যবহার সীমিত। সর্বশেষে তাই বলা যায়, চলচ্চিত্র প্রচার, প্রসার ও বিপণনের ক্ষেত্রে পোস্টারের কোনো বিকল্প এখনো হয়নি।

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	ভূমিকা	১৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	পোস্টারের পূর্ব-পর্যালোচনা ও তত্ত্বায়ন	৩১
তৃতীয় অধ্যায়	বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পোস্টারের বিবর্তন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	৪৬
চতুর্থ অধ্যায়	নির্বাচিত চলচ্চিত্র পোস্টারের নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	৮৭
পঞ্চম অধ্যায়	বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পোস্টারের বিবর্তন সার্বিক মূল্যায়ন	১৫৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	শেষকথা	১৬২
সপ্তম অধ্যায়	পরিশিষ্ট	১৬৯
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রকাশনা সমূহ		১৭৫

ভূমিকা

পোস্টার জনপ্রিয় প্রচার ও কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। আমাদের দেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, নির্বাচন, সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষাবিস্তার, সাংস্কৃতিক আয়োজন তথা নাটক ও চলচ্চিত্র প্রচারণায় পোস্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে রাজনীতি, চলচ্চিত্র ও নাটকের প্রচারণার মাধ্যমে পোস্টারের শিল্পিত রূপের বিকাশ ঘটেছে। বিভিন্ন থিয়েটার ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের প্রকাশিত পোস্টারে নান্দনিক ও শৈল্পিক ভাবনার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে পোস্টারের রয়েছে ঐতিহ্যময় ইতিহাস। বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু ১৯৩১ সালে *দি লাস্ট কিস* নির্বাক চলচ্চিত্রের অথবা পাকিস্তান আমলে প্রথম সবাক পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬) এর মাধ্যমে যাত্রা শুরু হলেও এই অঞ্চলে চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহের যাত্রা শুরু হয় তারও আগে ১৯২০ দশকের প্রথমদিকে 'পিকচার হাউজ' (বর্তমানে শাবিস্তান) এর মাধ্যমে। এসব প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের চলচ্চিত্র সম্পর্কে ধারণা দিতে বা দর্শকদের সিনেমা হলে টানতে বিভিন্ন ধরনের প্রচার মাধ্যম যেমন: পোস্টার, ব্যানার, লিফলেট, সংবাদপত্র/ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন, গানের বই, লবি কার্ড বা প্রেসকার্ড ইত্যাদির ব্যবহার সেই সময় থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

চলচ্চিত্রের প্রসার ও প্রচারণার ক্ষেত্রে পোস্টার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বা মাধ্যম হিসেবে এর জন্মলগ্ন থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পোস্টারের সঙ্গে চলচ্চিত্রের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। এই সম্পর্কের কারণেই পোস্টারই চলচ্চিত্রের 'প্রতীক' হয়ে ওঠে। পোস্টার মূলত ব্যবহৃত হয় সিনেমা হলে দর্শক টানতে এবং চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে। এই পোস্টারের মাধ্যমেই দর্শক চলচ্চিত্র সম্পর্কে একটি অগ্রিম ধারণা লাভ করতে পারে। অর্থাৎ চলচ্চিত্রটির উদ্দিষ্ট দর্শক কারা (শিশু না তরুণ) হবে, গল্পটি কেমন হবে (সামাজিক, অ্যাকশন না রোমান্টিক) ইত্যাদি। আবার চলচ্চিত্র পোস্টারে ব্যবহৃত ছবি, রঙ, ভাষা, ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদির ব্যবহার কিংবা উপস্থাপনের ধরনে আবার রয়েছে বিভিন্ন সময়ের ছাপ। বিভিন্ন সময়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে এসেছে